ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ৫৭০ কোটি টাকা লুটপাট

দূর্নীতিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, হ্যাটট্রিক শিরোপা আমাদের অক্ষুণ্ন থাকবে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভাগে দূর্নীতি এখন নীতিতে পরিণত হয়েছে। তার একটি প্রমাণ- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। এখানে শত শত কোটি টাকার প্রকল্প প্রতি বছর তৈরি হয়, নগরবাসীর সুবিধা অথবা নগরীর উন্নয়নের জন্য নয়, কেবলমাত্র লুটপাটের মাধ্যমে টাকা কামানো জন্য ... লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

কেস স্টাডি-১

২০০০ সালের শেষদিকে ঠিকাদার কোম্পানি নিপা এন্টারপ্রাইজকে ৯ কোটি ৪০ লাখ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার করা হয় নগরীর রাস্তা মার্কিং, জেব্রা ক্রসিং মার্কিং এবং দিকনির্দেশক সাইনবোর্ড লাগানোর জন্য। আইন অনুযায়ী ২ কোটি টাকার বেশি অর্থ খরচ করে কোনো কাজ করতে হলে এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগে। কিন্তু কোনো রকম প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনুমোদন না নিয়েই সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী শামসুল হক ভূঁইয়া এবং মেয়র হানিফ, শামসুল হক ভূঁইয়ার ভাগ্নে নূরুর রহমান ভূঁইয়াকে কাজটি করার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেন। এ প্রকল্পের অধীনে ৫ হাজার ৩৬৫টি নতুন সাইনবোর্ড , ১ হাজার ২৫০টি পুরাতন সাইনবোর্ড মেরামত করে পুনঃস্থাপন এবং ৪৫ হাজার বর্গমিটার সড়কে রোড মার্কিং ও জেব্রা ক্রসিংয়ের কাজ করার কথা ছিলো। কাগজে কলমে দেখানো হয়েছে চলতি বছরের জুনে কাজ শেষ হয়েছে। সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারবেন এই কাজে কি পরিমাণ ফাঁকি দেয়া হয়েছে। ডিসিসির বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন প্রকৌশলী প্রতিবেদককে

সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ

বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা

বলেছেন, সাড়ে ৯ কোটি টাকার রঙ এবং সাইনবোর্ড দিয়ে ঢাকা শহর ঢেকে দেয়া যায়। সেখানে ঠিকাদার ১ কোটি টাকারও কাজ না করে পুরো টাকাটা তুলে নিয়েছে। আর কাজটির ওয়ার্ক অর্ডার হওয়ার পরের বছর এপ্রিল মাসে প্রজেক্ট অ্যাপ্রুফ করা হয় শুধু বিল তোলার জন্য!' উল্লেখ্য, এই কাজের জন্য কোনো টেন্ডারও করা হয়নি।

কেস স্টাডি-২

গত বছর ১০ জুন ডিসিসির ২৮তম টেন্ডার কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বন্যা ও অতিবর্ষণজনিত প্রকল্পের' ৩০টি কাজের জন্য ডাকা টেন্ডার নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকল্প সমন্বয়কারী নুরুল আমীন তুলনামূলক বিবরণীতে দেখান ২৩ এপ্রিল ২০০১ তারিখের দৈনিক সংবাদ, ভোরের কাগজ ও ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় উক্ত কাজের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হয়েছে। সভায় তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান খন্দকার নির্ধারিত দিনের উক্ত পত্রিকাগুলো খুলে সবাইকে দেখান, প্রকৃত পক্ষে টেন্ডারগুলো উল্লেখ করা পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়নি। ঠিকাদার মাখন, নূরু ভূঁইয়া, কমিশনার মোখলেস, প্রকল্প সমন্বয়কারী নূরুল আমীন এবং মেয়র পুত্র সাঈদ খেকনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হবার পর্যায়ে ছিলো। শুধু এই একটি ঘটনা নয়, টেন্ডার নোটিশ না ছাপিয়ে টেন্ডার ছাপানো হয়েছে দেখিয়ে লেনদেনের মাধ্যমে টেন্ডার ভাগিয়ে নেয়ার ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে ডিসিসিতে। ৯নং জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী মফিজউদ্দিন, ৮নং জোনের আহমেদ আলী শাহসহ আরো কয়েকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে জানা যায়।

কেস স্টাডি-৩

২০০০ সালের জুন মাসে 'বন্যা ও অতিবর্ষণজনিত কারণে ঢাকা মহানগরীর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, প্লান্ট এবং ইকুইপমেন্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প' নামে ২২ কোটি ৩৩ লাখ ১৬ হাজার টাকার একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়। প্রথমত, টেন্ডার ছাড়াই কাজটি হারুনুর রশিদের নাজমা কনস্ট্রাকশনকে দিয়ে দেয়া হয়। এতে বাধা দেয়ায় প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী তারিক বিন ইউসুফকে ওএসডি করা হয়।

এর চেয়ে ভয়াবহ জালিয়াতি হলো এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্তত ১০টি রাস্তা এই দরপত্র আহ্বানের সময়েই ডিইউটিপি প্রকল্পের

সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী শামসুল হক ভূইয়া এবং বর্তমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইদ্রিস মিয়ারাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন সব টেন্ডার, কেনাকাটাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো

অধীনে উন্নয়ন কাজ চলছিলো। সে সড়কগুলো এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে কোনো কাজ না করেই অ্যাসফল্ট প্ল্যানের কাজ দেখিয়ে পুরো কাজের বিল তুলে নেয় নাজমা কনস্ট্রাকশন। কাজ না করেই যেসব রাস্তার উন্নয়ন কাজ দেখিয়ে বিল তোলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মহাখালী রেলক্রসিং থেকে বনানী, কাকলী পর্যন্ত রেল লাইন সংলগ্ন রাস্তায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ। গুলশান সড়ক নং ১০১, ১২৩, ১২০ এবং ১১৭-এর ২২ লাখ ২ হাজার টাকার মেরামত কাজ, মিরপুর রোডের শ্যামলী অংশের সার্ভিস রোডের ২৫ লাখ টাকার মেরামত কাজ, মিরপুর ১০ নং গোলচক্কর থেকে মাজার পর্যন্ত ২৪ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ, ২৭ লাখ ২২ হাজার টাকার অভয় দাস লেনের পুনর্বাসন কাজ, দয়াগঞ্জ, স্বামীবাগ এবং শাহসাহেব রোডের সাড়ে ৪৩ লাখ টাকার পুনর্বাসন কাজ, ১৭ লাখ টাকার যাত্রাবাড়ী ক্রসিং হতে সুতাখোলা সড়কের পুনর্বাসন কাজ প্রভৃতি।

শুধু এই একটি ঘটনা বা একটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নয়, ডিসিসির উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্তাব্যক্তি রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট ঠিকাদারদের সমন্বয়ে প্রতি বছর এরকম কাজ না করিয়ে অথবা সামান্য করিয়ে ভুয়া বিলের মাধ্যমে ডিসিসির অর্থ লুটপাট করেছে। বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা প্রতিবেদককে বলেছেন, 'আমার কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে, একই কাজের ওপর ৩/৪ দফা বিল করিয়ে নিয়েছে বিভিন্ন ঠিকাদার।'

কেস স্টাডি-৪

১৯৯৯ সালে মশার ওষুধ ছিটানোর নামে ৩ টনের অধিক ওজনের ৮টি ইউএলভি মেশিন কেনা হয় ডিসিসির স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য। প্রতিটি মেশিনের দাম পড়েছে ১৪ লাখ টাকা করে। একই বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এর প্রতিটির বাজার মূল্য ৫ লাখ টাকার বেশি নয়। অধিক মূল্যে কেনা হলেও এগুলো ব্যবহার অনুপযোগী। এই ৮টি মেশিনই কেনার ২ মাস পর থেকে ডিসিসির ৮টি জোনে অকেজো হয়ে পড়ে আছে বলে জানা যায়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই ফাইলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিজ করেছে বলে জানা যায়।

কেস স্টাডি-৫

২০০০ সালে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার জন্য ১৬টি হাইড্রোলিক লেডার (গাড়ি) আমদানি করা হয় চীন থেকে। প্রতিটি লেডারের দাম পড়েছে ১৩ লাখ টাকা করে। বিদ্যুৎ বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী ২০০০কে বলেছেন, 'আমদানির পর এগুলো বিদ্যুৎ বিভাগ একবারও ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ এতো ছোট আকারের গাড়ির ওপরে ভারী লেডার বসানো হয়েছে যে,

১০ বছরে রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন ও সংস্কার খরচ

আর্থিক বছর	নিজস্ব উৎস	সরকারি ও বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য	মোট (কোটি টাকায়)
১৯৯২-৯৩	৩৫.১৮	৯.৫৩	৪৪.৭১
১৯৯৩-৯৪	৪৩.৭৬	৬.২৬	৫০.০২
১৯৯৪-৯৫	৬৬.৪১	৯.৮৫	৭৬.২৬
১৯৯৫-৯৬	৪৫.৬২	৮.৪২	৫৪.০৪
১৯৯৬-৯৭	৭০.৮৩	১৭.৪৮	৮৮.৩১
১৯৯৭-৯৮	৪২.৬১	১৭.৩৫	৫৯.৯৬
১৯৯৮-৯৯	৫৬.২৯	৬২.৭০	১১৮.৯৯
১৯৯৯-২০০০	৬৭.৫৩	৯৭.৭৫	১৬৫.২৮
২০০০-২০০১	৭৪.১৪	১৪৪.৮৭	২১৯.০১
২০০১-২০০২	১২৮.২৫	৮৩.৫৫	২১১.৮০
সর্বমোট	৬৩০.৬২	৪৫৭.৭৬	১০৮৮.৩৮

ওর ওপরে কেউ উঠে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গেলে কাত হয়ে পড়ে তাকে জীবন দিতে হবে।' জানা যায়, এই প্রকল্প থেকে শামসুল হক ভূঁইয়া (ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী), সুজাত আলী খন্দকার এবং ইদ্রিস আলী (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী) লাভবান হয়েছেন। এই ক্রয় উপলক্ষে এরা চীনে প্লেজার ট্রিপও করেছেন। যান্ত্রিক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খন্দকার সুজাত আলী ২০০০-এর কাছে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি স্বীকার না করলেও এগুলো যে উচ্চ মূল্যে কেনা হয়েছে এবং একবারও যে এই লেডারগুলো ব্যবহার করা যায়নি তা স্বীকার করে বলেন, এগুলো কিভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায় সে জন্য একটি রিমেকিং প্রকল্প আমি তৈরি করেছি।

কেস স্টাডি-৬

বর্তমান মেয়র দায়িত্ব নেয়ার আগ মুহূর্তে বারিধারা এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নির্মীয়মাণ ওভারব্রিজের দু'টি গার্ডার ধসের ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছিলো। এরপর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং ডিসিসি দু'টি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করলেও ডিসিসির কমিটি ৫ মাসেও রিপোর্ট দেয়নি। মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ মতো অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। রিপোর্টে ডিসিসির ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পিএনডি সেকশনের কর্মকর্তা ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, চৌর্যবৃত্তিকে দায়ী করা হয়েছে। ডিসিসির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকর্তারা ফেঁসে যান বলে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাদের সেভ করার জন্য বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার দলের সাংসদ। এ কারণে সরকার তাকেও সেভ করার চেষ্টা করছে। মাঝখানে দু'টি প্রাণহানি এবং ডিসিসির প্রায় ২২ কোটি টাকার ক্ষতি হলো।

ওপরের এই ৬টি কেস স্টাডি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলো ডিসিসির বিলিং এবং কেনাকাটায় লোপাটের চলমান চিত্রের কয়েকটি নমুনা মাত্র।

এভাবেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অর্থ লুটপাট হয়েছে। করেছে এক শ্রেণীর ঠিকাদার, সরবরাহকারী। পার্সেন্টেজের বিনিময়ে তাদের সহায়তা করে যাচ্ছে ডিসিসির কিছু চিহ্নিত অসাধু কর্মকর্তা। নগরীর বা নগরবাসীর প্রয়োজনে নয়, টাকা লুটপাটের জন্য এখানে তৈরি হয় প্রকল্প, করা হয় যন্ত্রপাতি কেনাকাটা।

জন্ম থেকে জ্বলছে...

১৮৬৪ সালে স্থাপিত ঢাকা পৌরসভা দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৯৭৮ সালে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ১৯৯০ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়।

সিটি কর্পোরেশন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির কার্যপরিধি, গুরুত্ব এবং অর্থ প্রভাব কয়েক গুণ বেড়ে যেতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং লুটপাটের ঘটনা। স্বৈরশাসক এরশাদের সময়ে সিটি মেয়র নাজিউর রহমান মঞ্জুর তার কিছু নিজস্ব লোককে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার পরের মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত স্বল্প সময় পাওয়ায় বিশেষ কিছু করতে পারেননি। '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে ঢাকার মেয়রের দায়িত্ব দেয় মীর্জা আব্বাসকে।

মীর্জা আব্বাস প্রায় ৩ বছর দায়িত্বে ছিলেন। এ সময়ে নগর ভবন তৈরি ছাড়াও রাস্তাঘাট উন্নয়নে প্রচুর কাজ হয়। তার সময়ে ছাত্রদল, যুবদলের কিছু নেতা এবং ক্যাডার টেন্ডারবাজি এবং ঠিকাদারি করে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে ওঠেন। '৯০-এর ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদলের কিছু নেতা এবং ক্যাডার শূন্য থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পেছনে মীর্জা আব্বাসের সময়ে সিটি কর্পোরেশন বিশেষ অবদান রেখেছে।

১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি জনগণের

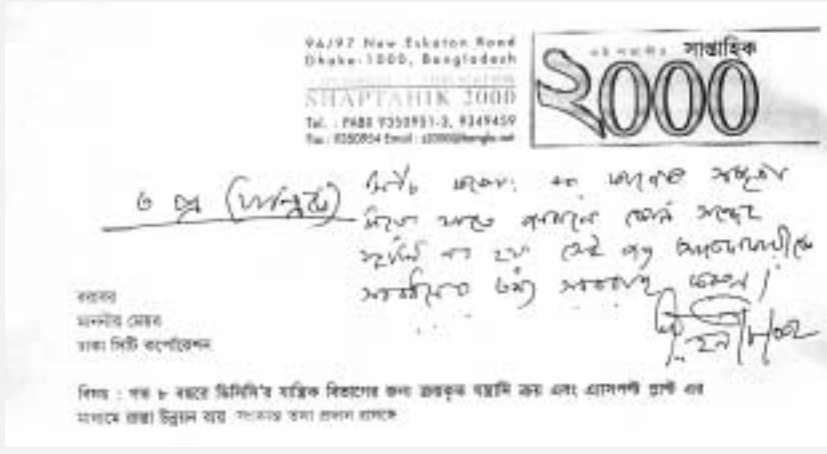

ডা: আশ্রাফ উদ্দিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এই বিভাগের সকল অনিয়মের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনিই

সুজাত আলীর ঔদ্ধত্য

96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh
SHAPTAHIK 2000
সাপ্তাহিক ২০০০

ডিসিসির যেসব বিভাগের কেনাকাটা এবং প্রকল্পে লোপাট বেশি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যান্ত্রিক বিভাগ। যান্ত্রিক বিভাগের ক্রয়সমূহ এবং এই বিভাগ থেকে পরিচালিত অ্যাসফল্ট প্লান্টের প্রকল্প ব্যয়গুলোর তথ্য পাওয়ার জন্য আমরা যোগাযোগ করি ১ মাস আগে। মেয়রের এপিএস সিদ্দিকুর রহমান মান্না যান্ত্রিক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুজাত আলী খন্দকারকে উক্ত তথ্যগুলো ২০০০কে সরবরাহ করার জন্য বলেন। সুজাত আলী এরপর তথ্য দেয়ার জন্য পরপর ৩টি তারিখ দিয়ে ঘুরাতে থাকেন। তৃতীয় দিন তিনি বলেন, এপিএস বললে হবে না, মেয়র স্বয়ং লিখিতভাবে আমাকে নির্দেশ দিলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সরবরাহ করবো। এরপর ২০০০-এর পক্ষ থেকে ওই তথ্য চেয়ে মেয়রের বরাবরে একটি দরখাস্ত করা হয়। গত ২৯ আগস্ট মেয়র সাদেক হোসেন খোকা দরখাস্তের ওপর সুজাত আলীকে অ্যাড্রেস করে লেখেন : 'সিটি কর্পোরেশনের কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে যাতে জনমনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয় সে জন্য আবেদনকারীকে সবধরনের তথ্য সরবরাহ করুন।'

মেয়রের নির্দেশটি সুজাত আলী খন্দকারের কাছে পৌঁছানোর পর তিনি আরো ৪টি ডেট দিয়েও তথ্য সরবরাহ করেননি। শেষ দিন তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'মেয়র লিখলে হবে না প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যদি বলেন তবেই আমি তথ্য দিতে পারি।' তিনি প্রতিবেদককে প্রশ্ন করেন আমি তো আপনার চাকরি করি না যে, আপনার কাজ নিয়ে পড়ে থাকবো।

প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক বিভাগের প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা লুটপাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই সুজাত আলী খন্দকার। তথ্য দিলে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে কেনাকাটা এবং অতিরিক্ত বিলিংয়ের দায়দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। এ কারণেই তিনি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফ। প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে তার কাছে নগরবাসীর প্রত্যাশা একটু বেশি ছিলো। তাছাড়া এই সুবক্তা নির্বাচন প্রাক্কালে সন্ত্রাস, মশক এবং আবর্জনামুক্ত আধুনিক ঢাকা উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বার বার।

কিন্তু মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কর্পোরেশন কিভাবে চলে তা তিনি খবর রাখেননি, রাখতেও চাননি। তিনি পরপর ৩টি অফিস আদেশ জারি করেন, তার পিএস-এর মাধ্যম ছাড়া কর্পোরেশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ফলে কর্পোরেশনের ১৩টি বিভাগের প্রধানরা ৮ বছরে কখনোই তাদের বিভাগীয় সমস্যাগুলো মেয়রকে বলতে পারেননি।

এই সুযোগে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী (সাবেক) শামসুল হক ভূঁইয়া, যান্ত্রিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুজাত আলী খন্দকার, এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস মিয়া এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডা. আশ্রাফ উদ্দিনদের একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিলো।

এরাই গত ৮ বছর নিয়ন্ত্রণ করেছে সিটি কর্পোরেশনের সব টেন্ডার কেনাকাটাসহ আর্থিক এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলো। এরা প্রত্যেকে এখন শত শত কোটি টাকার মালিক। এদের ৪/৫টির বেশি বাড়ি নামে-বেনামে আছে ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত এলাকায়। নামে-বেনামে বিভিন্ন ধরনের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা শুরু করেছেন এরা।

অভিযোগ আছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন শামসুল হক ভূঁইয়া। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস না করেই জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে তিনি এতো বছর সরকারি চাকরি করেছেন। এই জালিয়াতির দায়ে চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি সিলেটের কুলাউড়ায় 'সাগর নাল চা বাগান' নামে একটি বিশাল টি এস্টেট কিনেছেন। তার রয়েছে এ্যাগ্রো ব্যবসা। প্রতিষ্ঠানের নাম এপোলো মাল্টিপার্পাস এ্যাগ্রো লিঃ। অফিস ১৬/১ ইস্কাটন গার্ডেনে। সম্প্রতি মতিঝিলের জীবনবীমা টাওয়ারে ৭ম তলায় অফিস নিয়েছেন। এছাড়া কনস্ট্রাকশনসহ নানা ধরনের ব্যবসা তিনি করছেন। উত্তরা ৪ নং সেক্টরে রোড ২০/সি এ, ৬ তলার বিশাল বাড়ি এবং ইস্কাটনেও দু'টি বাড়ি রয়েছে তার। গত সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-৩ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছেন।

ভূঁইয়ার জালিয়াতি এবং...

ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ শামসুল হক ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে তাদের প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট নকল করার অভিযোগে। মামলাটি এখন বিচারাধীন রয়েছে। সার্টিফিকেট জাল হলেও তার রয়েছে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট। একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার সর্বোচ্চ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু তিনি মেয়র হানিফকে হাত করে আরো ৩ ধাপ এগিয়ে এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ভারপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন দীর্ঘদিন।

তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ারই হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডিসিসির সার্কেল ২-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মেহেদী আলী খান এই অবৈধ চেষ্টার বিরুদ্ধে মামলা করলে তার সাধ পূর্ণ হয়নি।

শামসুল হক ভূঁইয়া এককভাবে অর্থ আত্মসাৎ করতে পারতেন না। শামসুল হক ভূঁইয়া মেয়রকে প্রভাবিত করার জন্য বনানী লেকের ১১নং সড়কের ৭৬/সি প্লটটি মেয়র হানিফের স্ত্রীকে উপহারস্বরূপ দেন। ৫ কাঠার এই জমিতে হানিফ সহসাই গড়ে তোলেন ৬ তলা বিশিষ্ট আলিশান অট্টালিকা। বাড়ির সীমানা বাড়াতে গিয়ে তিনি লেকের বেশ কিছু জায়গা ভরাট করেছিলেন। যা নিয়ে বছর দুয়েক আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এ ছবিসহ রিপোর্ট হয়েছিলো। শামসুল হক ভূঁইয়া তার মতিঝিলের অফিসে ২০০০কে বলেন, 'যদিও প্রচার আছে মেয়র হানিফের সঙ্গে আমার সখ্য ছিলো, কিন্তু তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তার এবং সাবেক চীফ অফিসার রশিদুল আলমের জন্য আমি সাড়ে ৪ বছর কোনো কাজই করতে পারিনি।' তিনি বলেন, 'সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হলো সম্রাট, এই সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। ডিসিসির যেসব অনিয়মের সঙ্গে আমাকে জড়ানো হয়েছে তার জন্য আমি দায়ী নই, তবে কোনো কোনোটি করতে বাধ্য হয়েছি।'

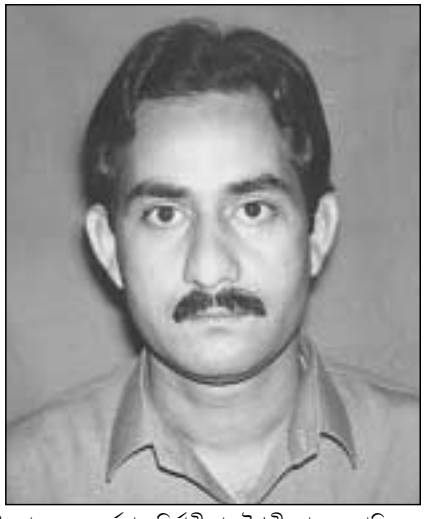

ডিইউটিপি প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক শফিউল ইসলাম এবং বর্তমান নির্বাহী প্রকৌশলী ফারুক আজিজ। এদের অসততা এবং অযোগ্যতার ফলেই ভেস্তে গেছে বিশ্ব ব্যাংকের ১২০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প

যেভাবে লোপাট হয়েছে ডিসিসির অর্থ

গত ১০ বছরে নগরীর রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য খরচ করা হয়েছে ১ হাজার ৮৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে ডিসিসির নিজস্ব উৎস থেকে খরচ করা হয়েছে ৬৩০ কোটি ৬২ লাখ টাকা। সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রকল্প সাহায্য থেকে খরচ করা হয়েছে এ খাতে ৪৫৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে মীর্জা আব্বাসের সময়ে খরচ হয়েছে ৯০ কোটি টাকা। বাকি প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা এ খাতে খরচ হয়েছে মেয়র হানিফের ৮ বছরে।

এই রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন এবং সংস্কার খাত থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ লোপাট হয়েছে। '৯৪ সালে মেয়র হানিফ দায়িত্ব নেয়ার পর সে বছরই সিটির ৯০টি ওয়ার্ডের কমিশনারদের প্রত্যেককে ৫০ লাখ করে ৪৫ কোটি টাকা বিতরণ করেন রাস্তা সংস্কারের জন্য।

ঐ বছর নগরীর রাস্তা তেমন ভাঙেনি। ফলে শুধু পিচের প্রলেপ বা সামান্য কাজ করেই কমিশনারগণ বাকি অর্থ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন। এরপর আর কখনো কমিশনারদের রাস্তা সংস্কারের অর্থ তিনি দেননি। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং যান্ত্রিক বিভাগের মাধ্যমেই তিনি কাজ করিয়েছেন। প্রথম বছর ৯০ জন কমিশনারের ভাগ্য খুললে পরের সাত বছর তা গেছে ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদারচক্রের পকেটে।

ঠিকাদার : প্রায় শূন্য থেকে শিল্পপতি

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ১৬০০-র মতো তালিকাভুক্ত ঠিকাদার রয়েছে। কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গত ৮ বছরে মাত্র ৭ জন ঠিকাদার ডিসিসির বড় বড় কাজগুলো করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে নাজমা কনস্ট্রাকশন । এই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি এই সময়ে কমপক্ষে

১৩০ কোটি টাকার কাজ করেছে। নাজমার মালিক হারুনুর রশিদ প্রায় শূন্য থেকে শত শত কোটি টাকার মালিক। কনস্ট্রাকশন, সরবরাহ ছাড়াও নানা রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন। এনসিসি ব্যাংকের পরিচালক হয়েছেন। এছাড়া নূরু ভূঁইয়ার ভূঁইয়া এন্ড কোং ৫০ কোটি, বড় খোকনের নিপা এন্টারপ্রাইজ ৩০ কোটি, কবিরের মোনামি এন্টারপ্রাইজ ৪০ কোটি, আঃ মোনেম লিঃ ৩০ কোটি টাকার কাজ করেছে কমপক্ষে ৬ বছরে। সরবরাহকারীদের মধ্যে ফজলুল হকের হিলটাউন ট্রেডার্স ২০ কোটি এবং সিনহা এন্টারপ্রাইজ কমপক্ষে ১০ কোটি টাকার মশার ওষুধ সরবরাহ করেছে এই সময়ে।

এই হারুনুর রশিদের সঙ্গে আছে ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী (সাবেক) শামসুল হক ভূঁইয়া, এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস মিয়া, যান্ত্রিক বিভাগে ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী সুজাত আলী খন্দকারের বিশেষ সখ্য। শামসুল হক ভূঁইয়া ২০০০কে বলেছেন, 'নাজমা কনস্ট্রাকশনের মালিক হারুনুর রশিদের বাড়ি আমার বাড়ির কাছে চাঁদপুরে। সে কারণে তার সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে।' ৫৬নং ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার মোখলেস মেয়রের ঘনিষ্ঠ হিসেবে এই হারুনুর রশিদের জন্য কাজ করতেন। এদের চুক্তি মতো ভাগ দিয়েই তিনি একের পর এক বড় বড় কাজগুলো নিয়েছেন বলে ডিসিসির উর্ধ্বতন সূত্র থেকে জানা যায়। নাজমা যে ১৩০ কোটি টাকার কাজ করেছে তার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৮ কোটি টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়েছে।

কাজের কয়েক গুণ অতিরিক্ত বিল

ধোলাইখাল পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭ কোটি টাকার কাজ করছে নাজমা কনস্ট্রাকশন। এই প্রকল্পে বক্স কার্লভার্ট তৈরি অন্তর্ভুক্ত আছে। নাজমার এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমে তাদের দরপত্র অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় ভুয়া কনসোডিয়াম কোম্পানি তৈরি করে কাজটি নাজমা নিয়ে নেয়। তারপর নিচু জমি ময়লা দিয়ে ভড়াট করে ওপর থেকে মাটির প্রলেপ দিয়ে পুরো ভড়াট মাটির দেখিয়ে বিল করিয়ে নেয়।

এছাড়া বক্স কার্লভার্ট ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য রড ও অন্য নির্মাণ সামগ্রীর দাম ধরা হয় অস্বাভাবিক বেশি। ২৯ হাজার টনের রডের দাম এসটিমেট করা হয় ৩৪ হাজার ৪০০ টাকা করে।

অ্যাসফল্ট প্ল্যান্টে পুকুর চুরি

প্রতিবছর অতিবৃষ্টি এবং অন্যান্য কারণে নগরীর ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা অ্যাসফল্ট প্লান্ট ছাড়াও বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প দ্বারা মেরামত করা হয়। এ খাতে প্রতি বছরই ৮/১০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগ কাজই করেছে নাজমা কনস্ট্রাকশন।

অ্যাসফল্ট প্ল্যান্টের কাজে যেখানে পাথরের নুড়ি দিয়ে ৪ ইঞ্চি পুরো করে ওপরে ঢালাই দেয়ার কথা সেখানে ইটের খোয়া দিয়ে দেড় বা ২ ইঞ্চি পুরো ঢালাই দেয় এরা। যেখানে ২ ইঞ্চি পুরো ঢালাই দেয়ার কথা, সেখানে আধা বা এক ইঞ্চি পুরো ঢালাই দিয়েই পুরো বিল তুলে নেয়। তারপর ২/৩ মাস যেতে না যেতেই রাস্তা আবার ভেঙে একাকার হয়ে যায়। সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা আবার প্রকল্প তৈরি করে। এরাই আবার একই কায়দায় কাজ করে। এভাবেই চলে রাস্তা সংস্কারের খেলা বছরের পর বছর।

এ বছরের শুরুতে টিকাটুলি থেকে হাটখোলার ইত্তেফাকের সামনের রাস্তাটিও অ্যাসফল্ট প্লান্টে সংস্কার করেছে নাজমা কনস্ট্রাকশন। ১ কোটির অধিক অর্থ ডিসিসির ব্যয় হলেও এখনই ভেঙেচুরে রাস্তাটির যাচ্ছেতাই অবস্থা। সাদেক হোসেন খোকা মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার ঠিক আগের দিন গত মে মাসে তাড়াহুড়া করে শেষ করা হয়েছে চাঁনখারপুল থেকে বকশিবাজারের দিকের রাস্তাটি। মেশিন দিয়ে কাজ করার কথা থাকলেও হাত দিয়ে এবং ব্যাপক অনিয়মের কারণে এখনই রাস্তাটি ভেঙে গেছে। রাস্তা সংস্কারের ২ মাসের মাথায় যদি রাস্তা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়, সে রাস্তার কাজে চুরি হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্য কোনো বাড়তি তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না। যান্ত্রিক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুজাত আলী খন্দকার অ্যাসফল্ট প্লান্টের কাজে চুরির বিষয়টি স্বীকার করে ২০০০কে বলেন, 'ভবিষ্যতে এটা যাতে রোধ করা যায় সেজন্য মনিটরিং জোরদার করার কথা ভাবা হচ্ছে।'

গত অর্থবছরে রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১২৪ কোটি টাকা। আমরা হিসাব উদ্ধার করতে পেরেছি এই সময়ে এ খাতে ২১১ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। অবশ্য একটি সূত্র দাবি করেছে, গত অর্থবছরে এ খাতে খরচ করা হয়েছে ৩২২ কোটি টাকা। এখন

যে কারণে পরিচ্ছন্ন হয় না নগরী

ঢাকা সিটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতি বছর ব্যয় হয় ১২৭ কোটি টাকা। ৭ হাজার ১৩৫ জন ক্লিনার, ৯০ জন ইন্সপেক্টর, ২০ জন সুপারভাইজার, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা ছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রে অনেক কর্মকর্তা। তারপরও পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না নগরী।

৯০টি ওয়ার্ডের প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৫০ থেকে ১০০ জন করে ক্লিনার নিয়োজিত আছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের ক্লিনারগণ সি.আই (কঞ্জারভেন্সি ইন্সপেক্টর)কে মাসিক ২০০/৩০০ টাকা করে দস্তরি দেয়। কারণ ঐ ক্লিনার মাসে ১৫ দিনও কাজে আসে না। দস্তরির বিনিময়ে সি.আই হাজিরা খাতায় হাজিরা সঠিক আছে দেখায়। কোনো ওয়ার্ডে ৮০ জন ক্লিনার থাকলে কাজ করে ৩৫ থেকে ৪০ জন। বাকি ৪০ জন অর্ধেক বেতনে ছুটিতে থাকে। মাসে ২২০০ টাকা বেতন হলে যার নামে চাকরি, সে পাবে ১১০০ টাকা, বাকি ১১০০ টাকা পাবে সি.আই হাজিরা ঠিক রাখার বিনিময়ে। এভাবে প্রতি ওয়ার্ড থেকে মাসে দস্তরি আদায় হয় ৩০/৪০ হাজার টাকা। সি.আই এই ৪০ হাজার টাকা থেকে সি. এস.আই. সি.ও (কঞ্জারভেন্সি অফিসার) সহকারী প্রধানকে দেয়। সি.সি.ও (চীফ কঞ্জারভেন্সি অফিসার)কে বেশি দেয়। কারণ বদলি করার ক্ষমতা সি. সি.ও-র হাতে। এভাবে সি.সি.ওর মাসিক আয় লক্ষাধিক

> এভাবেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অর্থ লুটপাট হয়েছে। করেছে এক শ্রেণীর ঠিকাদার, সরবরাহকারী। পার্সেন্টেজের বিনিময়ে তাদের সহায়তা করে যাচ্ছে ডিসিসির কিছু চিহ্নিত অসাধু কর্মকর্তা। নগরীর বা নগরবাসীর প্রয়োজনে নয়, টাকা লুটপাটের জন্য এখানে তৈরি হয় প্রকল্প, করা হয় যন্ত্রপাতি কেনাকাটা

প্রশ্ন জাগে, এসটিমেট কাজের চেয়ে বেশি কাজ হয়নি তবে খরচ দ্বিগুণ, তিনগুণ বেশি হলো কেন? এর কারণ হচ্ছে, এক কাজের ওপরে ২/৩টি বিল হয়েছে। যা ব্যয় করা হয়েছে তার তিনগুণ বেশি বিল করা হয়েছে যোগসাজশের মাধ্যমে।

যান্ত্রিক বিভাগ দুর্নীতির আখড়া

সিটি কর্পোরেশনের যান্ত্রিক-২-এর স্টোরকিপার মাহমুদ। বর্তমানে তিনি ডিসিসির কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। জনশ্রুতি আছে, ঢাকায় তার ১১টি বাড়ি আছে। যান্ত্রিক-২-এর স্টোরকিপার ছিলেন তিনি ১৫/১৬ বছর। শুধু মাহমুদ নয়, যান্ত্রিক বিভাগের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই ফুলে- ফেঁপে ধনবান হয়েছেন।

২০০০ সালে ১৩৪টি ট্রাক কেনা হয়েছিল নগরীর ময়লা অপসারণের জন্য। এর মধ্যে ৬০টি দেড় টনি। বাকিগুলো ৩ এবং ৫ টনি। ৫ টনি ট্রাকগুলোর দাম পড়েছিল ১৫ লাখ টাকা, যা বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। ৩ টনির দাম পড়েছিল ১৩ লাখ টাকা, এর প্রকৃত দাম এতো বেশি নয়। দেড় টনিগুলো কেনা হয়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজার করে।

এর আগে ডিসিসির ১৮০টি ট্রাক পানির দামে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। '৯৬ সালে মালবাহী ট্রেনের ট্রেলারের মতো বিশাল আকারের ৬টি ট্রেলার কেনা হয় প্রায় ২২ লাখ টাকা করে। প্রথমত এর দাম পড়েছে অস্বাভাবিক বেশি, তারপরও এগুলো পড়ে আছে ডিসিসির ওয়ার্কশপে। আজ পর্যন্ত এগুলো কাজে লাগেনি। কেনার সময় দেখানো হয়েছিল এগুলো ভাড়া দিয়ে আয় করা যাবে।

এছাড়া বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০০০-০১ অর্থবছরে ভারী যানবাহন মেরামত করার জন্য ১০টি গ্রুপে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এখান থেকে সিংহভাগ অর্থ লোপাটের অভিযোগ শোনা যায় ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারদের মুখে। ২ কোটি টাকার বেশি অর্থ খরচ করতে গেলে এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। তা এড়ানোর জন্য ২ কোটি করে ১০টি গ্রুপে ভাগ করে এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি করা হয়। শুধু এই একটি কাজ নয়, কমপক্ষে ২০টি প্রকল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি যাতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এড়ানোর জন্য ২ কোটি টাকা করে গ্রুপ ভাগ করে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছে। যান্ত্রিক বিভাগে এসব পুকুর চুরি সম্পর্কে ঐ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুজাত আলী খন্দকার বলেন, 'যতগুলো অভিযোগ আছে সব সত্য নয়, তবে কিছু কিছু কাজ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় করতে হয়েছে।'

প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শাহ্ আলম দেওয়ান

মশার ওষুধ কেনা হয়নি কিন্তু টাকা শেষ!

গত অর্থবছরের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি টাকা। এছাড়া মশক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বরাদ্দ ছিল আরো ৫০ লাখ টাকা। এই অর্থের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি খরচ হয়েছে। কিন্তু গত অর্থবছরে কোনো মশা মারার ওষুধ কেনা হয়নি, কোনো যন্ত্রপাতিও কেনা হয়নি। তবে এই অর্থ গেল কোথায়? অনুসন্ধানে বিভিন্ন ক্রাশ প্রোগ্রামের নাম ভাঙিয়ে এই অর্থ লোপাট করা হয়েছে।

ওষুধ না কেনার নেপথ্যে

গত ২ বছর ঢাকায় এডিস মাশার আক্রমণজনিত ভাইরাসের কারণে ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপক হারে হয়েছিল। এতে আক্রান্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, মারাও গেছেন কয়েকশ'। এমনকি তৎকালীন মেয়র নিজেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সে হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া হয়েছিল, চলতি বছরও এই ঘাতক হানা দেবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মশা মারার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয়া তো দূরে থাক, মশার ওষুধ ছিটানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে ছিল তাও গত প্রায় এক বছর বন্ধ ছিল। কারণ কর্পোরেশনের ভান্ডারে মশা মারার কোনো ওষুধ ছিল না। থাকবেই বা কিভাবে। গত বছরে কোনো ওষুধ কেনাই হয়নি। মশার ওষুধ কেন কেনা হলো না?

টাকা।

যে সি.সি.ও-কে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারে তার আর ওয়ার্ড থেকে ১০/১৫ বছর বদলি হতে হয় না। তাতে ক্লিনারগণের সঙ্গে সি.আই-এর ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক হয়। তখন ক্লিনারগণ সি.আইকে স্যার না বলে 'মামা' বলে সম্বোধন করে। ২/৩ বছর পর পর সি.আই বদলি করা হলে ক্লিনারদের সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারতো না।

সি.সি.ও'র আছে ঠিকা ক্লিনার নিয়োগের ক্ষমতা। কোনো ক্লিনার যখন মাসিক ২০০/৩০০ টাকা দস্তরি দিতে রাজি না হয় তখন সি.আই, এবং সি.সি.ও'র মাধ্যমে তার চাকরি চলে যায় কাজ না করার অজুহাতে। ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে নতুন একজনকে চাকরি দেয়া হয়। এই টাকার ভাগ করা হয় সি.আই থেকে সি.সি.ও পর্যন্ত। এই অর্থ থেকে ক্লিনার নেতারা পায় ক্ষেত্র বিশেষে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা।

ক্লিনার নেতা হিসেবে একবার ভোটে দাঁড়ালে তার পরিবারের আর কাউকে কাজ করতে হয় না। তখন সে নেতা। এভাবে প্রতি ২ বছর পর পর প্রায় ১৫০ জন ৬টি গ্রুপ থেকে নির্বাচন করে। এই ১৫০ জনের পরিবারের কোনো লোকই আর কাজ করে না। সাবেক হোক আর বর্তমান হোক তখন নগর ভবনের চতুর্থ তলার বারান্দায় সে কাজ না করে ঘোরাফেরা করতে থাকে প্যান্ট-শার্ট পরে। সি.সি.ও সাহেবের কাছে তাদের খুব দাম। এভাবে ৫০০/৬০০ ক্লিনার নগর ভবনে ঘুরে ঘুরে বেতন পায়। সি.সি.ও'র সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে সি.আইরাও তাদের সমীহ করে।

সব মার্কেটের ক্লিনার সি.সি.ও সাহেবের কেরানি কর্তৃক বিল করিয়ে থাকেন। কোনো পরিদর্শক থাকেন না। কোনো মার্কেটেই ৪ ভাগের ১ অংশ ক্লিনার কাজ করে না। কনটেইনার ক্লিনার ১১২ জন। যারা নামে মাত্র চাকরি করে। ১৫/২০ জনের বেশি দৈনিক কাজ করে না। ৮/৯ বছরের টোকাই ছেলে দ্বারা রাতে ময়লার গাড়িতে কাজ করানো হয়। মজুরি হিসেবে প্রতি রাতে ২০ টাকা পায় টোকাই। আর ৫৫ টাকা পায় বাসায় ঘুমানো ব্যক্তি। ১৫০ জনের মতো স্ট্রমি সুয়ার ক্লিনার আছে। কাজ কোথায় করে কেউ জানে না। বেতন পায় বাসায় বসে।

সিটি কর্পোরেশনের অর্ধেকের বেশি ক্লিনার একাধিক জায়গায় চাকরি করে। মাস্টাররোলের ক্লিনারদের একটি বড় অংশ কাজে না এসে অন্য কাউকে কাজে পাঠায়, যাকে সে তার মাসের বেতন থেকে ১০০০ টাকা দেয় এবং বাকি ২৮০০ টাকা কোনো কাজ না করেই মাস শেষে পেয়ে যায়। যে ১০০০ টাকা মাস শেষে পায় সে ৩৮০০ টাকার পরিমাণ কাজ করার কথা নয়। আবার বেতনের অর্ধেক সি.আইকে প্রদান করলে সাড়া মাসে কাজে না এসে পুরো মাস হাজিরা এবং বেতন ঠিক থাকে। কোথাও কোথাও একই পরিবারের ৬/৭ জন ক্লিনার চাকরি করে।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম মশার ওষুধ কেনার জন্য টেন্ডার হয়। তৎকালীন মেয়র এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডা. আশ্রাফউদ্দিনের আশীর্বাদপুষ্টরা লোয়েস্ট হতে পারছিল না বলে টেন্ডার দু'বার বাতিল করে তৃতীয়বারের মতো টেন্ডার আহ্বান করা হয়। এরপর চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি টেন্ডার কমিটি টেন্ডার অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মাহবুবুর রহমান এন্ড কোম্পানিকে লোয়েস্ট হিসেবে সিলেক্ট করে। কিন্তু মেয়র এবং আশ্রাফউদ্দিন সিলেক্টেট দরদাতাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়নি। না দেয়ার কারণ সে তাদের লোক নয়। ৬ মাস আটকে থাকার পর বর্তমান মেয়র গত জুন মাসে ওয়ার্ক অর্ডার দেন। এবং আরো ২ মাস পর ১৫ হাজার লিটার এডাল্টিসাইড কীটনাশক আসে কর্পোরেশনে।

শুধু ওষুধ নয়, ওষুধ ছিটানোর মেশিন কেনায় ঘটেছে আরো অনেক ঘটনা। সাতবার টেন্ডার আহবান করতে হয়েছে ৩০০টি ওষুধ ছিটানোর মেশিন কিনতে। ২০০০ সালের অক্টোবরে তৎকালীন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এডিবির কাছ থেকে ২ মিলিয়ন ডলার ঋণ নেয় মশক নিধন কার্যক্রমের জন্য। এর মধ্যে দেড় মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয় কীটনাশক ও মেশিন কেনার জন্য। বাকি ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা সার্ভিল্যান্স এন্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের খেয়ালিপনার কারণে এই পৌনে ৩ কোটি টাকা ফেরত চলে গেছে।

এই প্রকল্পের মেশিন কেনার জন্য সাতবার টেন্ডার হয়েছে একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্যই। ডিসিসির স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাব্যক্তি এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিব এবং এক সিনিয়র সহকারী সচিবের সঙ্গে আঁতাত করে টেন্ডার আহ্বান করেছেন, বাতিল করেছেন এবং পছন্দের সরবরাহকারীর সুবিধার্থে টেন্ডারের শর্তও পরিবর্তন করেছেন।

মশা মারার ওষুধ কেনায় প্রতিবার নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটে। প্রতিবারই অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যে কেনা হয়েছে ওষুধ। যেমন ২০০০ সালের লার্ভিসাইড (অ্যাবেট) কেনা হয় ১৫ হাজার লিটার। ডা. আশ্রাফের ঘনিষ্ঠজন মনির সিনহার প্রতিষ্ঠান সিনহা এন্টারপ্রাইজ এই ওষুধ সরবরাহ করে প্রতি লিটার ২২৫০ টাকা করে। কিন্তু এর প্রকৃত দাম প্রতি লিটার ১১০০ টাকা। ১৯৯৫ সাল থেকে জার্মানির সিকো ফ্লাই এবং অ্যাবেট ওষুধই মশা মারার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ওষুধের মান নিম্ন বলে জানা যায়। ঠিকাদার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অর্ডার করেই নিম্নমানের ওষুধ আমদানি করা হয়। কিন্তু দাম ধরা হয় উচ্চমানের ওষুধের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। তাছাড়া একই ব্র্যান্ডের ওষুধ এক যুগের বেশি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার হওয়ায় এই ওষুধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে মশার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে।

> যেখানে ২ ইঞ্চি পুরো ঢালাই দেয়ার কথা, সেখানে আধা বা এক ইঞ্চি পুরো ঢালাই দিয়েই পুরো বিল তুলে নেয়। তারপর ২/৩ মাস যেতে না যেতেই রাস্তা আবার ভেঙে একাকার হয়ে যায়। সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা আবার প্রকল্প তৈরি করে। এরাই আবার একই কায়দায় কাজ করে। এভাবেই চলে রাস্তা সংস্কারের খেলা বছরের পর বছর

মশা মারার কাজে নগরীতে ৭ শতাধিক কর্মী নিযুক্ত আছে। এর মধ্যে স্প্রেম্যান ৩০০, ক্রু ৩৫০ জন, স্টোরম্যান, সুপারভাইজার এবং অফিসার তো রয়েছেনই। এদের বেতন-ভাতা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি কেনাসহ এখানে প্রতি বছর ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু তারপর মাত্র ৩৬০ বর্গকিলোমিটার জায়গাও মশকমুক্ত হচ্ছে না। বরং মশার উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলছে।

বাইরে থেকে আমদানি করা হয় নিম্নমানের ওষুধ, তারপর তা থেকে চুরি করে সিংহভাগ খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়। তারপর বাকি ওষুধের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে ছিটালে তাতে মশা মরবে কিভাবে?

শুধু ডা. আশ্রাফ নয়, মশক নিয়ন্ত্রণ কমিটির আহ্বায়ক লালবাগের কমিশনার হুমায়ুন কবীর কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন এখান থেকে। লালবাগে ২ রুমের একটি টিনসেড বাড়িতে তিনি থাকতেন। এখন তার ৪ তলা বাড়ি হয়েছে। সুপার মার্কেটের মালিক হয়েছেন। সরবরাহ এবং কনেস্ট্রাকশন ব্যবসা করছেন নামে-বেনামে।

স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ঐ বিভাগের প্রধান ডা. আশ্রাফউদ্দিন বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'এসব কথা আমার এখন মনে নেই, তবে এসব পত্রিকায় আগেও লেখা হয়েছে কিন্তু তাতে কিছু হয়নি।'

অচল ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য ৫ কোটি

ঢাকা সিটির ট্রাফিক সিগন্যাল লাইটগুলো কয়েক বছর যাবৎ অকার্যকর এটা নগরবাসী মাত্রই জানেন। কিন্তু এই অচল বাতিগুলোতে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার লাগানোর নামে ২০০০-০১ অর্থবছরে ব্যয় করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এড়ানোর জন্য কাজটির ওয়ার্ক অর্ডার করা হয় ৭টি গ্রুপে ভাগ করে। অভিযোগ আছে, প্রথম ২ জন লোয়েস্ট দরদাতাকে বাদ দিয়ে তৃতীয় দরদাতা মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্সকে কাজ দেয়া হয়েছে দেড় কোটি টাকা বেশি ব্যয়ে।

অথর্ব ডিসিসি এবং বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক ঢাকা সিটির যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য ১২০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলো ডিসিসিকে।

৫ বছর মেয়াদি এই ডিইউটিপি প্রকল্পের ৩ বছর অতিবাহিত হবার পর ১০ শতাংশ কাজ না হওয়ায় বিশ্বব্যাংক ক্ষুব্ধ হয়। গত ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে কাজের ধীরগতি দেখে সরকারকে জানায়, ডিসিসিকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়। তাই তারা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে বলে, অন্যথায় অর্থ ফিরিয়ে

সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রশিদুল আলম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়তার সুবিধা নিয়ে ডিসিসিতে চালিয়েছেন স্বেচ্ছাচারিতা। তার নাম উঠে এসেছে বড় বড় আর্থিক অনিয়মের সাথে। তার জালিয়াতির একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন এই পরিচয়পত্রটি। সিটি কর্পোরেশনে চাকরি দেয়ার নাম করে এই কবির হোসেনকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন নিজেদের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে। শেষ পর্যন্ত তাকে চাকরি না দিয়েই তার নামে ইস্যু করেছিলেন এই পরিচয়পত্রটি।

নেয়ার হুমকি দেয়। তারা প্রকল্পে বিভিন্ন রকম অনিয়ম এবং দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাংক ডিসিসিকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাবে না।

এই হলো ডিসিসির ত্বরিতকর্মের নিদর্শন। অথচ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় দেড়শ' প্রকৌশলী রয়েছেন। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল, যার ঢাকায় ২/৩টি বা তারও বেশি বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট নেই। বিভিন্ন রকমের ব্যবসা আছে অনেকের। অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। এসব কোথা থেকে এলো, তদন্ত হয়নি কখনো।

দেনা ৬৩১ কোটি

২০০১-২০০২ অর্থবছরে ডিসিসির নিজস্ব আয় হয়েছে ১৩২ কোটি টাকা। কিন্তু একই সময়ে দেনার পরিমাণ ৬৩১ কোটি টাকা।

এরশাদ সরকারের সময়ে নগর ভবন নির্মাণের জন্য উত্তরা ব্যাংক থেকে ৩৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ঋণ নেয়া হয়। ৪ বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্মাণ কাজ চলে দীর্ঘ এক যুগ। এই ঋণের অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করার কথা থাকলেও মাত্র ১৬ কোটি টাকা পরিশোধ করার পর আর কিস্তি দেয়া হয়নি। ২০০১ সালে ৩৩ কোটি টাকার ঋণ সুদাসলে গিয়ে দাঁড়ায় ১২৪ কোটি টাকায়। গত বছর উত্তরা ব্যাংক টাকার পরিমাণ কমিয়ে ৭১ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। এখন মাসে মাসে বিভিন্ন মার্কেট এবং নগর ভবনের অফিস ভাড়া দিয়ে এই টাকা শোধ করা হচ্ছে।

নগর ভবন ছাড়া বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজ এবং ইউটিলিটি সার্ভিস বাবদ দেনা ১৬৩ কোটি ২৫ লাখ। ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীরা পাবে ৮৪ কোটি টাকা, ডিএসএল বিল বাকি ২২৫ কোটি, মার্কেট নির্মাণ ঋণ ১৩ কোটি ৮৪ লাখ, উন্নয়ন ঋণ ৩৩ কোটি ৯৫ লাখ এবং অন্যান্য দেনা ৪৬ কোটি ১ লাখ।

লোপাট ৫৭০ কোটি

৫৭০ কোটি টাকা লোপাট ৮ বছরে একটি অবিশ্বাস্য অঙ্কই বটে। কিন্তু ডিসিসির কর্মকর্তা, ঠিকাদার এবং এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা দাবি করেন, এই লোপাটের পরিমাণ এরচেয়ে অনেক বেশি হবে, দ্বিগুণও হতে পারে। তাদের যুক্তি হলো, গত ৮ বছরে নগরীর রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ১ হাজার কোটি ২ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। এ খাতে ব্যাপক লোপাটের ফলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ অর্থ লোপাট হয়েছে। এই খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে পুকুর চুরির যে ভয়াবহ চিত্র অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়, তাতে তাদের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। তবুও এই ৫৭০ কোটি

সাবেক মেয়রের পুত্র সাঈদ খোকন, নগর ভবনে তার পরিচয় এবং দাপট ছিল ২য় মেয়রের মতই

টাকার হিসাবের মধ্যে এই প্রকল্পে ৩০ শতাংশ ৩০০ কোটি টাকা অনিয়ম ধরা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবেশ অবকাঠামো প্রকল্প, অ্যাসফল্ট প্লান্টে প্রায় ১০০ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হতে পারে, এ রকম একটি ধারণা করা যায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। যান্ত্রিক বিভাগের বিভিন্ন কেনাকাটা ও অন্যান্য কাজেও অনিয়ম হয়েছে ব্যাপকভাবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এখানে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা অনিয়মের ধারণা করা হচ্ছে।

ডিসিসির প্রায় ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি গত ৫/৬ বছরে বেদখল হয়েছে, যা বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকাও ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগের কেনাকাটা এবং বিভিন্ন প্রকল্পে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা লোপাটের তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিচ্ছন্নতা বিভাগ, ডিসিসির ১০১টি মার্কেট, ডিইউটিপি প্রকল্প, আরবান হেলথ ফেয়ার প্রকল্পসহ ডিসিসির সব বিভাগ এবং সার্কেলে আর্থিক অনিয়মের যে তথ্য পাওয়া যায় তার হিসাব মেলানো সাধ্যের বাইরে।

> এখন প্রশ্ন জাগে, এসটিমেট কাজের চেয়ে বেশি কাজ হয়নি তবে খরচ দ্বিগুণ, তিনগুণ বেশি হলো কেন? এর কারণ হচ্ছে, এক কাজের ওপরে ২/৩টি বিল হয়েছে। যা ব্যয় করা হয়েছে তার তিনগুণ বেশি বিল করা হয়েছে যোগসাজশের মাধ্যমে

একই ধারা চলছে অবিরত

পছন্দের এবং দলের লোকদের সুবিধা দেয়ার একই ধারা চলছে। কর্মকর্তারা পার্সেন্টিজ নেয়ার পুরনো অভ্যাস থেকে যেন বের হয়ে আসতে পারছেন না। বর্তমান চীফ ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান মাহমুদ অতিবৃষ্টির ফলে ভেঙে যাওয়া নগরীর রাস্তাগুলো মেরামতের অগ্রিম দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন দুই ঠিকাদার কোম্পানিকে। কোনো রকম টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার হওয়ার আগেই ১ নং জোন থেকে ৫ নং জোন তন্ময় কনস্ট্রাকশনকে এবং ৬ নং জোন থেকে ১০ নং জোন পর্যন্ত নাজমা কনস্ট্রাকশনকে ভেঙে যাওয়া রাস্তা সংস্কারের মৌখিক অর্ডার দিয়েছেন টেন্ডার এড়িয়ে যা তিনি কোনোভাবেই পারেন না। বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেডএম শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত কয়েকজন ঠিকাদার যাতে তাদের বিল পেতে পারেন সেজন্য কাজ করছেন।

সুবিধাবাদি রাজনীতিকদের দল হিসেবে পরিচিতি আছে বিএনপির। এমন একটি দলে ত্যাগী এবং উদার নেতা হিসেবে সাদেক হোসেন খোকার পরিচিতি আছে। কিন্তু তার প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। বিপুল দেনা, ডেঙ্গু, ভাঙাচোরা রাস্তা, প্রশাসনিক অস্থিরতা, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ইত্যাদি ঠিকমতো সামলে উঠতে পারছেন না তিনি। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। পূর্ব থেকে হোমওয়ার্ক না থাকায় তিনি এখনো ডিসিসিকে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তিনি ধীরে চল নীতিতে অতি সতর্ক পা ফেলতে চাচ্ছেন, তাতে কর্পোরেশনের প্রাথমিক পাঠ পড়তে পড়তে শেষ হয়ে যাবে তার ৫ বছরের মেয়াদ।

সংশোধনী

৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'পড়াশোনা ও চাকরির বাজার : আমেরিকার বিকল্প' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, গত বছর বাংলাদেশ থেকে জাপান সরকারের স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ১৬ জন। বস্তুত গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে এর প্রকৃত সংখ্যা হলো ১৪৩ জন। এদের মধ্যে ১৬ জন বৃত্তি পেয়েছেন বাংলাদেশস্থ জাপানি দূতাবাসের সুপারিশে এবং বাকি ১২৭ জনের বৃত্তির জন্য রেকমেন্ডেশান পাঠিয়েছে বিভিন্ন জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের জাপানি দূতাবাসের ইনফরমেশান এন্ড কালচারাল সেকশানের সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।